**The Chittagong University Journal of Arts and Humanities**
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp. 99 - 106)
**Published in February, 2025**

# মামুনুর রশীদকৃত ওরা কদম আলী: নিম্নবর্গের মানুষের উত্থান

শাকিলা তাসমিন *

**প্রতিপাদ্যসার:** স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাট্যচর্চায় অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের জীবনাচার, প্রতিবন্ধক সমাজ ব্যবস্থা। বিশেষত যুদ্ধকালীন নারী নির্যাতন, লুট, রাহাজানি, গুম, খুন প্রভৃতি নাট্য রচনার প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। এ ধারার নাট্যকার হিসেবে মামুনুর রশীদ (১৯৪৮) অন্যতম। তাঁর নাটক সমূহে বিবৃত হয়েছে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনাচারের প্রেক্ষাপট। মামুনুর রশীদের নাট্যকাহিনিতে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের অন্তর্গত হৃদয়ের হাহাকার। মামুনুর রশীদ মূলত রাজনীতি, সমাজ ও শ্রেণি সচেতন একজন নাট্যকার। তাঁর রচিত নাটক সমূহের কাহিনি পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়টির যথার্থতা প্রতীয়মান হয়। তাঁর এ ধারার নাটক সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ওরা কদম আলী (১৯৭৯), ওরা আছে বলেই (১৯৮১), রাষ্ট্র বনাম (১৯৯৭), ইবলিশ (১৯৮৩), মানুষ (১৯৯১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই নাটক সমূহে বিধৃত হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনব্যবস্থা, জীবন ধারণের নানা ঘাত-প্রতিঘাত। তাঁর রচিত নাটকগুলো বিবেকবোধ সম্পন্ন মানবিক মানুষের হৃদয়ে প্রবলভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছে। মূলত তিনি সমাজের শ্রেণি বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। আলোচ্য প্রবন্ধেওরা কদম আলী নাটকে নিম্নবর্গের মানুষের প্রকৃত চিত্র কীভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন জীবিকা কঠোর ও কষ্টকর। যাদের বেশির ভাগই নিম্ন আয়ের অধিভুক্ত। দিন আয়ে দিনে খাওয়া অর্থাৎ যেদিনের আয় সেই দিনই ব্যয়, যদি সেটা না হয় তবে ভাগ্যে খাবারও জুটে না অধিকাংশ মানুষের। আমরা যদি আমাদের দেশের নিত্যকার পেশাদার মানুষের ধরন প্রত্যক্ষ করি তবে দেখা মেলে বেশিরভাগ মানুষ মাটি কাটছে ফসল ফলানোর নিমিত্ত, কাঁধে বোঝা বইছে, হাতুড়ি পিটিয়ে ইট ভাঙছে কিংবা অনেক মানুষ উচ্চ বিত্তের ময়লার ভাগাড়ে ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট থেকে নিজের পরিবারের অন্য সংস্থানের জোগান দিচ্ছে। এই চিত্র বাংলাদেশের সর্বত্র বিরাজমান। তেমনি একটি চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক মামুনুর রশীদ তাঁর নাটকে অঙ্গীকৃত করেছেন। তিনি তুলে ধরেছেন ঢাকা শহরের সদরঘাটের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনাচার। মামুনুর রশীদ মূলত এসকল নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনের নানা পর্যায় পর্যবেক্ষণ করে রচনা করেছেন নাটক ওরা কদম আলী। ওরা কদম আলী এই 'ওরা' শব্দটির মধ্যে নিহিত হয়েছে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন কথন। যারা নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এখানে নিম্নবর্গ শব্দের আভিধানিক অর্থ নিরূপিত হতে পারে এভাবে- এই শব্দটি ক্ষয়ে যাওয়া কিংবা অবহেলিত একটি জনগোষ্ঠীর আভাসরূপপে বিবেচ্য। এই নিম্নবর্গের প্রকারভেদ সম্পর্কে গবেষক বোরহান বুলবুল চারপ্রকার নিম্নবর্গের কথা বলেছেন:

১. নৃতাত্ত্বিক নিম্নবর্গ;
২. ধর্মীয় নিম্নবর্গ;
৩. সামাজিক নিম্নবর্গ;
৪. অর্থনৈতিক নিম্নবর্গ।

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বাভাবিকভাবে এই চারপ্রকার শ্রেণি বিভাজন বিষয়ে আলোকপাত করলে দেখা যায় সাধারণত যে সকল জনগোষ্ঠী সমতল কিংবা ভাটি অঞ্চলে কিংবা দুর্গম কোন স্থানে বসবাস করে তাদের নিম্নবর্গের মানুষ হিসেবে পরিচয় প্রদান করা হয়। আবার ধর্মীয়ভাবে বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, দাস, শূদ্র প্রভৃতি নিম্নবর্গের মানুষ বলে বিবেচিত। অন্যদিকে সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন না হয়ে শ্রমজীবী জীবন যারা অতিবাহিত করে তারাই নিম্নবর্গ। অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল জনগোষ্ঠী ও নিম্নবর্গের আধারে বিবেচিত। মূলত এই বর্ণ, ধর্ম, সামাজিক পদ মর্যাদা, আর্থিক সচ্ছলতাকে কেন্দ্র করেই নিম্নবর্গের উত্থান ঘটেছে।

সমাজের অবহেলিত নিম্নবর্গ নামীয় এই জনগোষ্ঠীর স্বরূপ উন্মোচনে বিশেষ ভূমিকা পালনে ব্রতী হয়েছেন নাট্যকার মামুনুর রশীদ। তাঁর রচিত নাটকে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে সমাজের মানুষ ও মানুষের মানবিক বিপর্যয়ের দিক সমূহ। মূলত মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর নাট্য জগতকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। সেই ধারাতেই মূলত ১৯৭২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আরণ্যক নাট্যদল। এই নাট্যদলের প্রথম নির্দেশিত নাটক মুনীর চৌধুরীর কালজয়ী রচনা 'কবর'। দেশাত্মবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বারংবারই মামুনুর রশীদকে তাড়িত করেছে নব সৃজনে। নাট্যকার মামুনুর রশীদ মূলত শ্রেণি বৈষম্য, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও সোচ্চার ছিলেন। এ বিষয়ে জানা যায়: "সামরিক শাসনামলে যখন কোন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক দল সাহস পায়নি 'মে দিবস' এর তাৎপর্য তুলে ধরতে; তখন আরণ্যক এক মে দিবস পালন করেছে" (গোস্বামী ৫৭)। মামুনুর রশীদ বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের দীর্ঘ ইতিহাসের সুযোগ্য ও নির্ভীক পথযাত্রী। থিয়েটারের সুদীর্ঘ চর্চা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নাট্যনির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ বলেছেন: "মামুন ভাইকে আমি বলি নিঃসঙ্গ পথিক, শুরু থেকে যে আদর্শ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, এখনো সেই আদর্শে অবিচল আছেন। তিনি কখনো আপস করেননি। স্বৈরশাসক এরশাদের দেওয়া বাংলা একাডেমি পুরস্কার তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন" (বাচ্চু ৭)।

বাংলা নাট্য সাহিত্য ভাণ্ডারে মামুনুর রশীদ ভিন্নমাত্রিক নাটকের উপাদান ও বিষয়ে কেবল নতুনত্ব আনয়ন করেননি, তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নাট্যচর্চার ধারাকে বেগবান ও নিরীক্ষাধর্মী নাটক উপস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল শাসন ও শোষণের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে তিনি শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার পরিমণ্ডলে বিস্তৃত করেছেন গ্রাম, মহল্লায় এমনকি পথ নাটক প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এই ধারায় মামুনুর রশীদ পথ নাটকের যাত্রা শুরু করেন। এ বিষয়ে জানা যায়ড় তাঁর এই চেষ্টার ফসল হিসেবে 'আরণ্যক' ১৯৮৩ সালে মান্নান হীরা রচিত 'ক্ষুদিরামের দেশে' অভিনয়ের মধ্যদিয়ে ৭ম নাটকের যাত্রা শুরু করে। এছাড়াও সংগ্রামী নাট্যকার মামুনুর রশীদ উপস্থাপন করেন ওরা কদম আলী, মে দিবস (১৯৮৫), শেকল (মান্নান হীরা) আইজল সখিনার পালা (আব্দুল্লাহেল মাহমুদ, ১৯৯২) প্রভৃতি পথ নাটক। যা তাঁর নাট্যদল 'আরণ্যক' কর্তৃক প্রদর্শিত হয়। তাঁর এই নাটকসমূহে প্রবলভাবে তুলে ধরা হয়েছে রাজনীতির অসম সমন্বয়, সাধারণ জনমানুষের জীবন ও জীবিকার অসম বণ্টন, মানুষের জীবনের নানাবিধ সংকট প্রভৃতি। মামুনুর রশীদকৃত নাটক সেটা হোক রচনা কিংবা উপস্থাপনা তার প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র নানাবিধ সঙ্কটের প্রতিচ্ছবি। মামুনুর রশীদ মূলত মানবেতর মানুষের আশার কথা ভাবেন, উত্তরণের পথ দেখেন। তিনি তাঁর রচিত নাটকে কেবলই প্রধানতর করে তুলেছেন নিম্নতর মানুষের জীবনাচার। তাই তো তাঁর নাট্যদল আরণ্যক এই স্লোগানকে সামনে রেখে এগিয়ে চলছে শিল্পবোধ জাগ্রত করছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। মামুনুর রশীদ প্রতিষ্ঠিত আরণ্যক নাট্যদল, যাদের স্লোগান- 'নাটক শুধু বিনোদন নয়। শ্রেণিসংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার' (হক ১৯৭)। এই স্লোগানকে ধারণ করে এগিয়ে চলেছে এবং শ্রেণী সংগ্রামের মূল বিষয় ও বক্তব্য থেকে প্রজন্ম, প্রচার ও প্রসারে অগ্রনী ভূমিকা পালন সমর্থ হয়েছে।

ওরা কদম আলী তেমনি একটি নাটক যেখানে রয়েছে শ্রেণি সংগ্রাম এবং শোষক শ্রেণি থেকে পরিত্রাণের তীব্র প্রতিবাদ। মূলত ঢাকায় অবস্থিত বুড়িগঙ্গা নদীপাড়ের বসবাসরত মানুষের নিঃশব্দ বঞ্চনার কাহিনি। নাটকটির চরিত্রসমূহ নিঃসাড়, নিস্তব্দ, আত্মাভিমান যেন সমগ্র নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর এই চরিত্র নির্মাণে নাট্যকার বোবা কদম আলীকে সকল বঞ্চনার প্রতীক রূপে গ্রাহ্য করছেন। মামুনুর রশীদ টেলিভিশন ও মঞ্চনাটকে নাট্যকার হিসেবে সফলতার সাক্ষর রেখেছেন। তিনি একজন নন্দিত মঞ্চ অভিনেতাও বটে। বাংলা নাটক সমূহকে জীবনের মূল স্রোতে অঙ্গীকৃত করার অভিপ্রায়ে তিনি বলেছেন: "নাটক হোক কল্যাণের জন্য, নাটক হোক সুন্দরের জন্য। সমাজ ভাবনা ও শিল্পচেতনা দুইয়ের সমন্বয় সাধনের মধ্যদিয়ে সামগ্রিকভাবে নাট্যচর্চাকে আমরা অর্থবহ করে তুলতে চাই" (নাহার ৫১)।

ওরা কদম আলী জার্মান ভাষায় অভিনীত ও অনূদিত। অভিনেতাও ছিলেন জার্মান ভাষাভাষী, ওরা কদম আলী নাটকটির মূল উপজীব্য বাংলার সাধারণ মানুষের চলমান জীবনের নানামাত্রিক কাহিনি। নাটকটির শুরু হয় একজন সন্তানসম্ভবা নারীর প্রসবকালীন মর্মযন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে। যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের অব্যবস্থাপনায় কিংবা শ্রেণি বৈষম্যের কারণে অনাগত সন্তান এবং মায়ের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাকে ছাপিয়ে একে একে আবির্ভূত হয় নানা চরিত্র। এ ধরনের চরিত্র সমূহের মধ্যদিয়ে আলাদা আলাদা মানুষের জীবন চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। নাটকে আঠারটির অধিক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রত্যেক চরিত্রের ভিন্নার্থক জীবন কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নাট্য কাহিনিতে পরিদৃষ্ট হয় একটি জনপদে বসবাসকারী মানুষের কথা, যারা নিত্যকার জীবন ধারণের প্রয়োজনে প্রায়শই অভিমুখী হয় এই জীবন তরীর ঘাটে। সেখানে উপস্থিত চরিত্র সমূহের মধ্যে রয়েছেড় বিক্ষুব্ধ হকার, হরেক রকম জিনিস বিক্রেতা, বই বিক্রেতা, চায়ের দোকান, পানি সরবারহকারী প্রমুখ। নাটকের অন্যতম চরিত্র 'কদম আলী' ও তাজু, মূলত কদম আলী ও তাজুর মধ্যদিয়ে নাট্যে সকল শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহ্বান ধ্বনিত হয়। নাট্যে যে সংকটসমূহ বিবৃত হয় তা হলো শোষক শ্রেণি পুলিশের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সন্তান সম্ভবা নারীর সন্তানসহ মৃত্যু। অন্যদিকে রাবেয়া চরিত্রটি নানা প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করে সে একজন নারী হিসেবে নিজেকে সমাজে টিকিয়ে রাখবার প্রাণান্তর চেষ্টা করে। এছাড়াও নাটকে বর্ণিত হয়েছে চাঁদাবাজ ইন্সপেক্টর ও পুলিশের কর্তা-ব্যক্তিদের দুঃসাহসের চিত্র।

প্রকৃতপক্ষে সত্তর দশকে রচিত ওরা কদম আলী নাটকে প্রতিফলিত হয় সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার দুর্বিষহ চিত্র। নাটকের শুরুতে সদর পরিলক্ষিত হয় সদর ঘাটের বাস্তব চিত্র ও ঘাটে বিচিত্র পেশার মানুষের আগমন। প্রত্যেক চরিত্রের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর রূপধারণ করে। মূলত এই সদরঘাটের দৈনন্দিন চিত্রে এমন কিছু মানুষের সন্ধান মেলে যাদের আবাসস্থল খোলা আকাশের নিচে। মাথার উপর নেই কোনো আচ্ছাদন, রোদ, বৃষ্টি, ঝড় উপেক্ষা করে রাত দিনের আবর্তে ঘুরতে থাকে দিন, মাস কিংবা বছর। যখন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হয় কিংবা গুটিকতক মানুষকে চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে তখন অজানা, অনামা বাসস্থানের উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। ওরা কদম আলী নাট্য কাহিনির স্তরে স্তরে বর্ণিত হয়েছে মানুষের সংগ্রামী জীবনকথা। নাট্যে বর্ণিত মলমওয়ালা ক্ষুধা নিবৃত্তির পূর্বে মলম বিক্রির তোড়জোড় শুরু করে সে বলে:

মলমওয়ালা: আমার বন্ধু, আপনার বন্ধু, আমাদের সকলের বন্ধু পাঁচশ সাত নম্বর আশ্চর্য মলম। তুফান এ্যাণ্ড কোম্পানীর নব্য আবিষ্কৃত এই ধন্বন্তরী ব্যবহারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিওর। বিফলে মূল্য ফেরত ইন ক্যাশ। আছেন ভাই কেউ? (রশীদ ৭৬৫)।

এই মলম বিক্রি সমকালীন একটি পেশা যা এখনো দৃষ্টিভূত হয়। কোনো রকম মলম বিক্রির আয়ে দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের হিসাব মেলাতে গিয়ে পরিবারকে হিমশিম খেতে হয় কিংবা সাধারণ নুন-ভাতের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। অন্যদিকে নাট্যে উদ্ভাসিত রাবেয়া চরিত্রটি কলসি কাঁখে পানি সরবরাহের কাজ করছে বিভিন্ন দোকানে। তার নেই সাজানো ঘর নিকানো উঠান। রাতের আঁধারে পুরুষের পৌরুষের থাবা থেকে প্রতিনিয়ত নিজেকে আগলে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা। আমাদের এই সামাজিক ব্যবস্থায় নারী সর্বক্ষেত্রে অবজ্ঞার সাথে সমাজে টিকে থাকবার অবিরাম সংগ্রাম করে চলছে। এখানে রাবেয়া যেন সমগ্র নারীর প্রতিনিধিত্ব করছে। রাবেয়ার দৈনন্দিন জীবনধারণের একমাত্র উৎস দোকানে কলসি দিয়ে পানি সরবরাহ। তাতেই দেখা যায় পারিশ্রমিকের হিসাব মেলাতে গিয়ে শুনতে হয় নানা কটূকথা কিংবা অশালীন ইঙ্গিত। রাবেয়া এই ঘাটে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে রাখতে প্রতিনিয়ত তর্কযুদ্ধে নিজেকে জয়ী করবার চেষ্টা করে, উক্ত সংলাপে তাই প্রতিফলিত হয়েছে:

রাবেয়া: হুনছ তোমরা? হুন। ঘাটের পয়সায় কেউ দুই পাই কম দিলে যে ব্যাপারী হার্টফেল করে সাতকার হে আমারে দিবো ঠিলায় আট আনা কইরা। কিন্তু হুন ব্যাপারী, রাবেয়া পয়সা কামাই করে গতর খাটাইয়া, পরিশ্রম কইরা, ইজ্জত খাটাইয়া না (রশীদ ৭৬৭)।

রাবেয়ার প্রতি সর্দারের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় না রাবেয়া, তাইতো মাতাল সর্দার ঘুমঘোরে থাকা রাবেয়ার মাথায় স্পর্শ করলেই ক্ষীপ্ত রাবেয়া সর্দারকে বলে:

রাবেয়া: কিন্তু কেন তুই আমার শরীরে হাত দিছস?
সর্দার: দিমু না কেন? তুইও আমার মতই ঘাটের বেওয়ারিশ মাল। (থেমে) হাছা কইছি না? (রশীদ ৭৬৮)

স্বামী ও সন্তানহীন রাবেয়া মূলত তাজু ও কদম আলীকে স্নেহ ও ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখতে তৎপর। তাজুকে স্বীয় সন্তান জ্ঞান করে বুকের চাপা কান্না থামাতে চেয়েছিলো। কিন্তু সেখানেও ঘাটের কিছু মানুষের হিসাব নিকাশের খাতায় চলে যায় তাজু। তারা ভালোবাসায় নয় তাজুকে শিশুশ্রমের আশায় ভাগাভাগির পাল্লায় মাপতে থাকে, নায়েব আলীর সংলাপে সেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

নায়েব আলী: কেলা, উই পোলা রাখবো কেলা? আমার ঘর নাই, বাড়ী নাই? আমার ঘাটের বেবাক বেওয়ারিশ মাল আমার। উই নিবো কেলা? (রশীদ ৭৬৮-৭৬৯)।

একদিন গভীর রাতে সন্তানতুল্য তাজুকে ঘুম পাড়ানিয়া গানে ঘুম আর স্বপ্নের বিভোরতায় হঠাৎ সর্দারের আগমনে অসহায় হয়ে ওঠে রাবেয়া, সর্দারের অশালীন আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইলে সর্দার বলে: "নেশা করছি নেশা। নেশা না করলে যে তর নেশা ছাড়ন যায় না। তুই আমার নেশা হারামজাদী, তুই আমার নেশা" (রশীদ, ৭৭৫)। রাবেয়া সমাজের অধিকাংশ মানুষের হিংস্র থাবা থেকে বাঁচতে চায়। তাই সে কদম আলী ও তাজুকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে নিমগ্ন হয়। মাতৃসম রাবেয়ার হৃদয়ের গহীনে বপিত স্বপ্ন পূর্ণ করতে হঠাৎ ক্ষুদার্থ তাজু খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে অভিমান বশত বলে:

তাজু: না, খামু না।
(কদম আলী জানতে চায়, কেন?) তাইলে এই রাস্তা ছাইড়া একটা ঘর ন্যাও। হেই ঘরে আমরা তিনজন থাকুম। (কদম আলী জানতে চায়, কি ব্যাপার?) আমি, তুমি আর হে (রশীদ ৭৮৫)।

সকল বঞ্চনা ভালোবাসার স্পন্দন কদমের প্রতি রাবেয়ার। কদমের সততা, দায়িত্ববোধ রাবেয়াকে উদাসী করে তোলে। সে যেন সকল কিছু উপেক্ষা করে মনমাঝি কদমের বৈঠা হাতে চলতে চায়। তাইতো রাবেয়া গায়েনের সাথে গান ধরে-

মাঝি চলরে উজান বাইয়া, মাঝি চলরে উজান বাইয়া,
বেগে ছোটো পিছু না হটো সামনের দিকে চাইয়া
মাঝি চলরে উজান বাইয়া।।
ঐ দ্যাখা যায় আমার আলো, আগে চলো আগে চলো ও
ও জীর্ণ আবর্জনাগুলো ফুতকারে দাও উড়াইয়া
মাঝি চলরে উজান বাইয়া। (রশীদ, ৭৮৮)।

সেই থেকে রাবেয়া কদম আলীর ছায়ায় আবছায় ভালবাসায় অনুভবের সঙ্গী হয়ে আছে। রাবেয়া কদম আলীর সাথে ঘর বাধাঁর স্বপ্নে যখন স্মীত হেসে ওঠে তখন বুকটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপে। কারণ রাবেয়ার পূর্বের বিবাহে তার কপালে সুখ সহ্য হয়নি। আজ সে স্বামী, সন্তানহীন, গৃহছাড়া নারী হিসেবে সমাজে ধিকৃত। শুধু তা নয় স্বামীহীন নারী যখন পরপুরুষের লোলুপতার শিকার হয় তখন আত্মসম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে হয়ে ওঠে বেপরোয়া ক্রুদ্ধ, এর ফলে স্বার্থান্বেষী পুরুষ ভয় পেয়ে পিছু হটে। আসলে একটি নারীকে সমাজে নূন্যতম খাদ্য ও বাসস্থান ও সংস্থানের নিমিত্ত একগুঁয়ে ও রূঢ় হতে হয়। অন্তত কতিপয় মানুষ ভয় পেয়ে কাছে যেতে চায় না। রাবেয়া তেমনি ক্রুদ্ধ ও বেপরোয়া ভঙ্গিতে ঘাটের ব্যাপারী, রমিজুদ্দি, আব্দুল্লাহ মনসুর সকলের প্রতি এভাবে তার মনোভাব ব্যক্ত করে:

রাবেয়া: হুনতে অইবো তর- আমারে তরা পাগল বানাইয়া দিছস। দিনের পর দিন রাইতের পর রাইত- এই ঘাটের ঐ হারামখোর ব্যাপারী, রমিজুদ্দীন, আব্দুল্লাহ, মনসুর, তুই তরা সবাই গাঙ্গের পানির মত বানাইছস আমাগো জান, আমাগো ইজ্জত- আর- (রশীদ ৭৯০-৭৯১)

মামুনুর রশীদকৃত প্রতিবাদী চেতনার নাটক ওরা কদম আলী নিপীড়িত, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানুষের জীবনকথা। যেখানে নিপীড়নকারীর সংখ্যা অজস্র। আর প্রতিবাদ করছে শুধুমাত্র বোবা কদম আলী, রাবেয়া ও তাজু। বোবা কদম আলী সংলাপবিহীন মুখাবয়বের অভিব্যক্তি শারীরিক বলিষ্ঠতা ও চলন কদম আলী চরিত্রের প্রতিবাদী ভূমিকা প্রবলতর হয়ে ওঠে। নিম্নোক্ত সংলাপে তা উপলব্ধি হয়:

সারেং: তাইলে লন আমার লগে। [সর্দার ও সারেং বেরিয়ে যায়। কদম আলী উত্তেজিত হয়ে রাবেয়াকে আবারও মারতে এগোয়। বাধা দেয় আলীমুদ্দি। কদম আলী বোঝায়, সে রাবেয়াকে খুন করে ফেলবে।]

আলীমুদ্দি: ঠিক আছে, ঠিক আছে খুন করিস। আগে তাজুকে পাইয়া লই। (কদম আলী তবু উত্তেজিত।) ঠিক আছে, সর্দার তো গেছেই তাজুরে আনতে (রশিদ ৭৮৮)।

ওরা কদম আলী নাটকের চরিত্র সমূহ বিভাজিত করলে দেখা যায় নাট্য চরিত্র সমূহের মধ্যে রয়েছে আমাদের আবহমান বাংলার সাধারণ মানুষ। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যড় চা বিক্রেতা, বই বিক্রেতা, হাড়ি পাতিল বিক্রেতা, পানি সরবরাহকারী, মলম বিক্রেতা, কুলি, সারেং, সিগারেট ও পান বিক্রেতা, তৈজসপত্র খেলনা বিশেষ বিক্রেতা

প্রভৃতি চরিত্র একেবারে খেটে খাওয়া মানুষ। যারা সারাদিনে উপার্জিত অর্থে সংসার চালায়। কেউ ঘর সংসারহীন ঘাটে বিনিদ্রায় রাত্রিযাপন করে। অন্যদিকে সর্দার, ইন্সপেক্টর, আলীমুদ্দি, মনসুর, আব্দুল্লাহ, কলিমুদ্দি, রমজান, পুলিশ এরা শাসক শ্রেণি। সমাজের যারা খেটে দুবেলা খেয়ে বাঁচতে চায় তাদের শোষণ করে। অত্যাচারে ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ নাট্যের সকল চরিত্রই নাটকের শেষে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কদম আলী ও রাবেয়া চরিত্রের নেতৃত্বে শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সমাজের চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। নাট্যের শেষান্তে সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-"আমরা কদম আলী"। রাষ্ট্রীয় শাসক শ্রেণি নিরপরাধ কদমকে আসামী চিহ্নিত করে শাস্তির জন্য ধরে নিতে আসলে ইন্সপেক্টর বলে:

ইন্সপেক্টর : একটিও যেন পালাতে না পারে। কদম আলী কে?

সর্দার : আমি কদম আলী।

আলীমুদ্দি : আমি কদম আলী।

সারেং : আঁই কদম আলী।

রাবেয়া : আমি কদম আলী।

ইন্সপেক্টর : ননসেন্স, হু ইজ কদম আলী?

সবাই : আমরা কদম আলী। (রশিদ ৭৯০)

আমাদের দেশের বলিষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে মামুনুর রশীদ অন্যতম সমাজ সচেতন নাট্যকার। তাঁর নাটকের মূল উপজীব্য শ্রেণি সংগ্রাম। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

মামুনুর রশীদ আমাদের বিবেচনায় সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমাজ সচেতন। তাঁর নাটকে শ্রেণিসংগ্রাম বার বার ফিরে এসেছে। তাঁর প্রথম আলোচিত নাটক ওরা কদম আলী। এটিও বাংলাদেশে বহুল অভিনীত। ওরা কদম আলী-র পর মামুনুর রশীদ রচনা করেছেন 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'এখানে নোঙর', 'গিনিপিগ'। তাঁর প্রায় সব নাটকেই সামাজিক শোষণ এবং সম্মিলিত প্রতিরোধ এবং সবশেষে বিজয়ের প্রতিধ্বনি বিবৃত হয়েছে। শোষিতকে অধিকার সচেতন করতে তাঁর নাটক একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। গ্রামের চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর নৈপুণ্য ঈর্ষণীয়।

মামুনুর রশীদের নাটকে প্রতিফলিত হয়-

১. রাজনৈতিক সচেতনতা

২. সমাজ সচেতনতা

৩. শ্রেণি সচেতনতা

৪. শোষক ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

৫. রাষ্ট্রের অসামঞ্জস্যতা

৬. নিম্ন শ্রেণির জীবনাচার

৭. বাঙালির মানবিক জীবন সঙ্কটের চিত্র

৮. জীবনবোধ

৯. শিল্পচেতনা

১০. মুক্তিযুদ্ধ

মামুনুর রশীদের ওরা কদম আলী মঞ্চ ও শিল্প সফল নাটক। তিনি নিপুণতর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের বাস্তবধর্মী জীবনকে শিল্পিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। নাটকটি প্রায় ১৮ টি চরিত্র ও চারটি দৃশ্য ও একটি দৃশ্যান্তর পর্বে বিভাজিত।

বাঙালি জীবনাচারের প্রেক্ষাপটে রাত্রি থেকে ভোর আসে সূর্যালোকের বিচ্ছুরণে। যেমনটি রয়েছে নাটক শুরুর প্রথম দৃশ্যে: "সময় সকাল বেলা। ঠিক সূর্য উঠবার আগের মুহূর্ত। কুলীদের চীৎকার। লোকজনের চীৎকার। লঞ্চের ভেঁপু শোনা যায় – ঘাটে ভিড়বার আগে যেমন বাজে...। নাট্যকার অত্যন্ত সুকৌশলে একটি সদর ঘাটের বাস্তব চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন এবং চরিত্র সমূহের যে চলন বলন তাতে নিম্নবর্গের উপস্থিতি সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়েছে। সদর ঘাটের ঘাট পারাপারের টাকা সংগ্রহ বেচা-কেনা, চরিত্রসমূহে রাত্রিযাপনের নানা চিত্র, চাঁদার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব, অবশেষে পিতা-মাতা হারা তাজুকে নিয়ে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর টানা হেঁচড়া, মদ্যপায়ী সর্দারের অশালীন আচরণ নাটকটিকে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন বোধের কিংবা জীবনাচারের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

নাটকে রাবেয়া সম্ভ্রম বাঁচাতে ধারালো অস্ত্রে নায়েব আলী ব্যাপারীর কান কেটে ফেলে। ছোট চরিত্র তাজুর মধ্যে মানবতা, সততা, বীজ বুনতে সক্ষম হয় কদম আলী ও রাবেয়া। তাইতো সদরঘাটের শাসক ও শোষক শ্রেণি নানা বিরুপাচরণ তাকে প্রভাবিত করেনি। তাজু যে কোন পরিস্থিতিতে রাবেয়া ও কদম আলীকে আঁকড়ে ধরেছিল। শেষাবধি গুম ও খুনের মুখোমুখি হয়ে ফিরে যায় তার পিতার নিকট। নাট্য চরিত্র সমূহের মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের যে ভাষা তা পাঠক ও দর্শককে সত্যিই প্রতিবাদী হবার আহ্বান করে।

মামুনুর রশীদ ওরা কদম আলী নাটকে প্রধানত নিম্নশ্রেণির ছিন্নমূল ও ভাসমান মানুষের জীবনসংগ্রামের কষ্ট ও ক্লান্তিকর জীবনযুদ্ধের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। মূলত এই নাট্যঘটনা শাসক ও শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে কিংবা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য উজ্জীবিত করে। এই নাটকে দেখা যায় নিম্নবর্গ ও নিচুতলার মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রাখতে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এতে করে নাট্যসংলাপে চরিত্রসমূহ আরও সুদৃঢ় ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছে। শুধু তা নয় নাট্য সংলাপ প্রক্ষেপণ নাটকের যথার্থতা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। যার মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণির মানুষের চলন, বলন, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা এবং নাট্য কাহিনির প্রবাহমানতাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে একথা যুক্তিযুক্ত।

**তথ্যসূত্র**

বুলবুল বোরহান। বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গ (২০১৪)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হক, ড. মোঃ জাকিরুল। দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা (১৯৪৩-১৯৯০)। বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

রশীদ, মামুনুর। শতবর্ষের নাটক (সম্পাদিত ১ম খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

বাচ্চু, নাসির উদ্দিন ইউসূফ। ২০১৬, 'মামুনুর রশীদ আমাদের উৎপল দত্ত মামুনুর রশীদ সম্পর্কে নাসির উদ্দিন ইউসূফ বাচ্চু'র সাক্ষাৎকার, জাগো নিউজ২৪.কম, ২৪ এপ্রিল ২০১৬, বিনোদন।

গোস্বামী, আশিস [সম্পা]। আরণ্যক একটি দলের নাট্যকথা। মধ্যমা, ২০০১।